শুঁয়োপোকা

আমার ছোটদাদু সবাইকে নাস্তানাবুদ করতে ভালবাসেন। ছোটদাদু আমার সত্যিকারের দাদু নন। সম্ভবত কারোই দাদু নন, কারণ তিনি বিয়েই করেননি মোটে। যাই হোক, বহু বছর ধরে তাঁকে ওই নামেই সম্বোধন করে আসছি আমরা। আমি ও আমার স্বামী বীরেন।

মাঝে কয়েক বছর যোগাযোগ ছিল না। তারপর হঠাৎ নয়ডায় আমাদের ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে হাজির হলেন সেদিন। দলবল নিয়ে দিল্লী দর্শনে এসেছেন। কার কাছে নাকি শুনেছেন আমরা এখানে থাকি। ফোনে-ফোনে যোগাযোগ করে ঠিকানা জোগাড় করে এসে হাজির একেবারে আমাদের দরজায়। আমি ও বীরেন খুবই উৎফুল্ল হলাম, বলাই বাহুল্য। ছোটদাদুর সঙ্গে যে ভদ্রলোকটি এসেছেন, তাঁর নাম প্রফুল্ল সরকার। ওঁদের দলের মোট ন'জন সদস্যের অধিকাংশই ভাগলপুর থেকে এসেছেন। এদের মধ্যে চারজন নিজেদের পূর্বপরিচিতের বাড়ি উঠেছেন। ছোটদাদু, প্রফুল্ল সরকার ও আরও তিনজন উঠেছেন একটা গেস্টহাউসে।

বীরেন বললো, "এটা কি করে হয়? আমরা কি আপনার পূর্বপরিচিতের থেকে কিছু কম? আপনি বাকি ক'টা দিন আমাদের কাছে থেকে যান।"

শেষ অবধি রফা হল সেই গোটা দিনটা আমাদের বাড়িতে কাটাবেন। অন্য কোথাও যাবেন না।

ফোনে হলদিরামে অর্ডার দিতেই আধঘণ্টার মধ্যে 'ডিলাক্স থালি' চলে এলো। পোলাউ, পরোটা, গোটা তিনেক ব্যঞ্জনাদি সহ ফাস্টক্লাস লাঞ্চ। লাঞ্চ খেয়ে সোফায় গা এলিয়ে জোর আড্ডা দিচ্ছি সবাই মিলে। চারটের সময় চা দেবো। শুধু চা। পরে পাঁচটা নাগাদ বীরেন মোড়ের দোকান থেকে গরম গরম সিঙ্গাড়া আর জিলিপি নিয়ে আসবে। একেবারে টাটকা ভাজা। ওই সময়টাতে ভাজে রোজ। তখন আরেক দফা চা করবো।

কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় দরজায় ঘণ্টি বাজলো টুং-টাং করে।

"আমার কাজের মেয়ে সুরভি এলো। কেট্‌লিটা বসিয়ে দিতে বলি," বলে দোর খুলতে গেলাম। দরজার বাইরে সুরভি আর তার মেয়ে কলা দাঁড়িয়ে। আমি দরজা খুলে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম স্ট্যাচু হয়ে। সুরভি আলগোছে আমার আঁচলটা হাত দিয়ে সরিয়ে অতি সন্তর্পনে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লো। কলাও মায়ের দেখাদেখি ঘাড় নীচু করে ঘরে ঢুকলো। আমি ওদের পিছুপিছু রান্নাঘরে এলাম। সুরভি একটানে পরনের বাহারি জর্জেট শাড়ি খুলে একটা খালি র‍্যাকে জড়ো করে রাখলো। শালখানা আগেই নামিয়ে রেখেছে সেখানে। সাটিনের চকমকে ব্লাউজ ও পেটিকোটের উপর আমার এপ্রনখানা চাপিয়ে চায়ের সরঞ্জাম রেডি করতে করতে সিঙ্কে বাসনকোশন জড়ো করছে মাজবে বলে। কলা টুক করে দেখে এলো সবসুদ্ধু ক'জন লোক রয়েছে বাড়িতে - সেইমত কাপ ডিশ এগিয়ে দেবে মাকে।

এতক্ষণে ভাষা খুঁজে পেয়ে শুধোলাম, "স্কুলে যাওনি?"

"হ্যাঁ, গেছিলাম তো। সেখান থেকেই সোজা আসছি এখানে। সি-ব্লকের বৌদি এবেলাটা ছুটি দিয়েছে। বললো, 'তোকে তো কলার ইস্কুলে যেতে হবে সুরভি, ওবেলা আমার বাড়ি আসার দরকার নেই।'"

সকালবেলা সুরভি বলেছিল আজ তাকে স্কুলে যেতে হবে। কলার রেজাল্ট বেরুবে। গার্জেনদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছে প্রিন্সিপাল। পাড়ার নিউ ডন পাব্লিক স্কুলের দু'খানা ক্লাসরুমে বিকেলে প্রতিদিন আরেক দফা স্কুল বসে বস্তির গরীব ছেলেমেয়েদের নিয়ে। অত সেজেগুজে সেখানেই গিয়েছিল সুরভি। মেয়ের হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট আনতে। গতবার রেজাল্ট আনতে গিয়ে দিদিমনির বকুনি শুনতে হয়েছিল সুরভিকে, নিজের নামটুকু লিখতে পারে না বলে। গার্জেনদের সই করতে হয় পরীক্ষার খাতা দেখে।

গার্জেনরা তাদের ছেলেমেয়ের লেখা পড়তে না পারুক ক্ষতি নেই কিন্তু নাম সইটা বাধ্যতামূলক। তাই এবার কলা মা'কে নাম লিখতে শিখিয়েছে বহু চেষ্টা করে। পুরো বর্ণমালা নয়, শুধু নামটুকু।

"তা নাম লিখলো তোর মা?"

কলা ঠোঁটে ঠোঁট চিপে ঘাড় নাড়লো। তার মা নাকি ক্লাসরুমে ঢোকেইনি মোটে। বাইরে বসেছিল। ওর মামাতো ভাই বিকাশ, যে দু'ক্লাস উপরে পড়ে - ক্লাস ফাইভে - সে-ই সাইন করেছে কলার গার্জেনের প্রতিভু হয়ে।

ও-ঘরে জোর আড্ডা চলছে। আমি সুরভিকে কাজ বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম। ছোটদাদু নানারকম হাসির কথা বলছে, বীরেন ও প্রফুল্ল সরকারের সঙ্গে খুনসুটি করছে। কলা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

ছোটদাদু শুধোলেন, "এটি কে?"

পরিচয় দিয়ে বললাম, "হাফ ইয়ার্লিতে ভাল নম্বর পেয়েছে। আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

ছোটদাদু বললেন, "বটে? অঙ্ক কেমন শিখেছ দেখি? প্রশ্ন হ'ল টোয়েন্টি সিক্স্ সোলজার রাস্তা দিয়ে যায়, টোয়েন্টিটা আম পড়ে, কে কটা পায়?"

বেচারি কলা মুখে মুখে কুড়িকে ছাব্বিশ দিয়ে ভাগ করার দুরূহ চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছে। ছোটদাদু চশমার ফাঁক দিয়ে সকৌতুকে চেয়ে রয়েছেন ওর দিকে। আমরা উত্তরটা জানি, টোয়েন্টি সিক্স্ সোলজার নয়, ওটা আসলে টোয়েন্টি শিখ সোলজার। কুড়িজন সৈনিক কুড়িটা আম অনায়াসে ভাগ করে নিতে পারে। শুধু বলার কায়দায় শ্রোতা বেচারি কুড়িজন শিখ সৈনিককে ছাব্বিশ জন সৈনিক ভেবেছে।

ছোটদাদু বললেন, 'যাক গে অঙ্ক থাক, তোমার ইংরিজীর দৌড় দেখা যাক। সি - এইচ - এ - এল - কে কি উচ্চারণ হবে বলো দেখি? চলকে না কলকে?"

কলা বিব্রত মুখে বিড় বিড় করে অক্ষরগুলো আউড়ে নিয়ে নেতিবাচক মাথা নাড়লো।

তারপর ভয়ে ভয়ে বললো, "চক।"

ছোটদাদু ভুরু কুঁচকে বললেন, "চক? নাকি কলকে?কিংবা চলকে?"

কলা আবার সসঙ্কোচে বললো, "চক।"

ছোটদাদু বললো, "আর একটা প্রশ্ন। এফ - এ - টি কি হয়?

কলা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, "ফ্যাট।"

"ফ্যাট মানে?"

কলা বললো, "মোটা।"

বল তো, "এইচ - ই - আর কি হয়?"

কলা বললো, "হার। মানে তার। উসকা।"

"আর এই দুটো শব্দ একসঙ্গে মিলে কি মানে হয়?"

কলা এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললো, "ফাদার। পিতা।"

"যাও, পাশ করে গেলে।"

আমি পাশের ঘর থেকে দু'খানা বই এনে কলার হাতে দিয়ে বললাম, "তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা করেছ বলে তোমায় এই দুটো বই দিলাম।"

তারপর শুধোলাম, "তোমার মা অত করে নাম লেখা শিখলো। হঠাৎ কি হল ওর? ক্লাশে গেল না কেন?"

কলা বললো, "মা ভয় পেয়ে গেল। বললো দিদিমনির সামনে গিয়ে নাম লিখতে পারবে না। ওর সব গুলিয়ে গেছে।"

বললাম, "তার মানে তোমার মাকে আরও ভাল করে শিখতে হবে।"

কলা ঘাড় দুলিয়ে সায় দিলো। তারপর রান্নাঘরে চলে গেল। ছোটদাদু এবার আমায় নিয়ে পড়লেন।

"বলো দেখি, 'বিড়াল - তর - স্তম্ভ' কি জিনিস?"

বিড়াল-তর মানে বোধহয় বিড়ালের থেকে বড়। বাঘ-সিংহ'কে ইংরিজীতে বিগ ক্যাট বলে জানি। তার

সঙ্গে রয়েছে স্তম্ভ।

বললাম, "অশোক স্তম্ভ কি?"

বীরেন খিক্ খিক্ করে হাসতে লাগলো। ওর এই স্পেশাল হাসিটা আমাকে চটানোর জন্যে। অশোক স্তম্ভ সঠিক উত্তর নয় জেনে অবাক হলাম। ছোটদাদু খেলা খেলা গম্ভীর মুখে বললেন, "অশোক স্তম্ভ নয়, শুঁয়োপোকা। ইংরিজীতে caterpillar।"

"বিড়াল - বিড়ালতর - বিড়ালতম এইভাবে cat - cater - আর pillar তো সোজাসুজি স্তম্ভ।" প্রফুল্ল সরকার এতক্ষণ পরে সবাক হয়ে খোলসা করে বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা। এটা কিন্তু চিটিং। যাই হোক, শুঁয়োপোকা আমার ভারি অপছন্দ। দেখলেই গা কুটকুট করে।

কিন্তু প্রজাপতি? রঙ বেরঙের ডানাওলা প্রজাপতিগুলো যেন প্রকৃতির ডালিতে ফুলের বাহার। কোন মন্ত্রবলে ডালি থেকে বেরিয়ে এসে নেচে খেলে বেড়াচ্ছে।

আমায় নীরব দেখে ছোটদাদু বললেন, "শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতিতে রূপান্তর এক আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? এরকম রূপান্তর মানুষের মধ্যেও দেখা যায়। এই যে কলা মেয়েটিকে দেখলাম। হয়তো বিশ বছর পর কোন বড় সংস্থায় উচ্চপদে আসীন হয়ে কত সম্মান, শ্রদ্ধা ও প্রশংসার পাত্রী হবে। কে বলতে পারে?"

- ২ -

ছোটদাদুর কথাগুলো আমার মনে দাগ কেটেছিল। আমি নিজেও এরকম রূপান্তর দেখেছি। রামসেবককেই ধরা যাক। রামসেবক আমাদের বাড়িতে যখন এলো ওর বয়স এগারো কি বারো হবে বড়জোর। রোগা হাড়গিলে, সারা গা দিয়ে খড়ি উড়ছে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের চেহারায় একটা কমনীয়তা থাকে, ওর মধ্যে ছিটেফোঁটাও ছিল না তার। আমাদের গয়লানী ওকে এনে দিয়েছিল। বললো আমাদের বাড়ি ফাই-ফরমাস খাটবে। ছেলেটি গয়লানীর বাপের বাড়ির দেশে থাকতো। দারুণ "ভুখমারী" হয়েছিল সেবার। আনাজ-পত্তর সব কিছুর আকাশ ছোঁয়া দাম। গয়লানির গ্রামের বহুলোক অনাহারে প্রাণ দিয়েছে। রামসেবকের পরিবারে সে ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। এবার গ্রামে গিয়ে ছেলেটাকে নিয়ে এসেছে, যদি কোথাও আশ্রয় জুটে যায় সেই আশায়। আমাদের বাড়িতে সে সময় ফাই-ফরমাস খাটার জন্যে বাড়তি কোনও ছেলে ছোকরার প্রয়োজন ছিল না। সারাদিনের চাকর হরিসাধন ও উপরি কাজের জন্যে ঠিকে ঝি শনিচরি ছিল। তারাই বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম করতো। কিন্তু গয়লানী রামসেবককে আমাদের ভিতর বাড়ির বারান্দায় বসিয়ে চলে গেল। গয়লানী বলেছিল রামসেবক তার কেউ নয়, ওর প্রতি তার কোন দায়িত্ব বর্তায় না। নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে বাসে বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। গাঁয়ের সেই মৃত্যুপুরী থেকে তুলে এনে শহরে পৌঁছে দিয়েছে। এরপর ছেলেটা বাঁচলো কি মরলো তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই তার।

আমার মা নেহাৎ অপারগ হয়ে রামসেবককে আশ্রয় দিলেন। ওই একরত্তি ছেলেটাকে শহরের ভির-ভারাক্কায় হারিয়ে যেতে দিতে প্রাণে বাধলো তাঁর। তবে এর জন্যে পরে আফসোস করতে হয়েছে মা'কে। বয়স ও আকারে ছোট হলে কি হয়, রামসেবক একটা ধানী লংকা যাকে বলে।

আমাদের বাড়িতে আসার হপ্তাখানেকের মধ্যেই রাস্তার কুকুরে কামড়ালো রামসেবককে। আমাদের এলাকার রাস্তাগুলোয় অগুণতি কুকুরের আনাগোনা। এদের মধ্যে ঠিক কোন কুকুরটা কামড়েছে শনাক্ত করতে পারলো না রামসেবক।

বাবা বললেন, "কুকুরটা পাগল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'বার উপায় যখন নেই, সেক্ষেত্রে রামসেবককে সবক'টা ইনজেকশন যথাযথ দিইয়ে নেওয়াই ভাল। সাবধানের মার নেই।"

আমার ছোটকাকা অল্পদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিলেন। রামসেবককে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বিধিবৎ ইন্‌জেকশন দেওয়ানোর ভারটা উনিই নিলেন। এর মাসখানেক পর আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী গুরশরণ সিং'এর ব্যালকনি থেকে পড়ে পা ভাঙলো রামসেবক। আমাদের রান্নাঘরের ছাদের পাশে টানা পাঁচিল টপকে গুরশরণ সিং'এর ঝুল বারান্দায় যাওয়া যায় তা এর আগে কারও মাথায় আসেনি। এ ঘটনার অল্পদিন পরেই

গুরশরণ সিং মিস্ত্রী-মজুর লাগিয়ে ঝুলবারান্দার এদিকের অংশটায় দেয়াল গেঁথে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিল।

মা বললেন, "এই কাজটা আগে করলে খামোকা রামসেবককে ঝাড়া তিনমাস পায়ে প্লাস্টার পরে থাকতে হ'ত না।"

এর পর আমি পাটনা কলেজে ভর্তি হলাম। হস্টেলে থাকি। ছুটি-ছাটায় বাড়ি যাই কেবল। বাড়ি গিয়ে প্রতিবারই রামসেবকের নতুন নতুন কীর্তি-কলাপের বিবরণ শুনি। সত্যিই আজব ছেলে। ভাঙা-ফেলা-ছেঁড়া, জিনিসপত্র নষ্ট, রাজ্যের যত অঘটন রামসেবকের নিত্য সঙ্গী। রবিঠাকুরের পুরাতন ভৃত্য কবিতাটার সঙ্গে বেশ মেলে, "একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করি আনে, তিনখানা দিলে একখানা থাকে বাকী কোথা নাহি জানে।"

মা দুঃখ করে বলেন, "ছোঁড়াটার যদি কোনও চালচুলো থাকতো কবে বিদায় করে দিতাম। ওর যে যাবার কোন ঠাঁই নেই।"

বছর পাঁচেক কেটে গেছে রামসেবকের এ বাড়িতে পদার্পণ করার পর। দিনে দিনে গুণপনা বেড়েই চলেছে। ভাল খাবার-দাবারের উপর দারুণ লোভ। ভয়ে কেউ ওকে দিয়ে বাজার থেকে মিষ্টি মেঠাই আনায় না, প্রসাদ করে আনবে বলে।

ছোটকাকা বললেন ওঁর ছোটবেলায় একবার নাকি ওঁকে রসগোল্লা কিনতে পাঠিয়েছিল কেউ। নির্জন পথে ভাঁড়ের রসগোল্লা থেকে একটা করে আলগোছে গালে ভরছেন, তারপর সেটা সন্তর্পণে ভাঁড়ে ফেরৎ রেখে আরেকটি গালে ভরছেন। গোনাগুনতি রসগোল্লা। সঠিক সংখ্যা, সঠিক রঙ রূপ। অতিথি ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে রসগোল্লাগুলোর একটা গোপন অতীত আছে। আমার ছোটকাকা দারুণ গুলতাপ্পি দিতেন। অতি প্রবল কল্পনাশক্তি ছিল তাঁর। ছোটকাকার গল্পকথা আমরা উপভোগ করতাম, কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করতাম না। ছোটকাকা সেনা বাহিনীতে ঢুকেছিলেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে কাশ্মীর উপত্যকায় এক আকস্মিক প্রবল তুষারপাতে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। ছ'মাস পরে বরফের তলা থেকে ছোটকাকার দেহ যখন খুঁজে পাওয়া গেল, মৃত্যুর এতটুকু ছাপ পড়েনি তাঁর মুখে। মনে হচ্ছিল ছোটকাকা যেন গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর বিচিত্র গল্পগুলোর মত তাঁর মৃত্যুটাও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল আমাদের। এখনও মনে হয়।

রামসেবকের কথায় ফিরে আসি আবার। রামসেবক লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট খেতে এবং বাজারের পয়সা মারতে শুরু করলো। একবার ওর নানির অসুখ হয়েছে বলে দু'দিনের ছুটি নিয়ে সাসারাম গেল। মা জানতো না ওর নানি আছে, এই প্রথম শুনলো। শুনলো নানির অবস্থা নাকি কথঞ্চিত ভাল। নানি সাসারামে থাকে বরাবর, মেয়ের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের হালচাল জানে না। তখনকার দিনে চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল না। বিশেষ করে যেখানে দুপক্ষই নিরক্ষর। তাছাড়া মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর পর তার খোঁজখবর নেওয়া তখনকার দিনের সমাজ ভাল চোখে দেখতো না। নানি নাকি অনেক বছর পর এখন খোঁজ পেয়েছে তার। নানির চিঠি পেয়ে রামসেবক তার সঙ্গে দেখা করতে বদ্ধপরিকর হ'ল। সাসারাম যাচ্ছে বলে সেই যে গেল আর তার খবর নেই। শেষে বাবা একটা পোস্টকার্ড পেলেন। সেই চিঠি পড়ে অবগত হলেন রামসেবক নাকি বিনাটিকিটে রেলভ্রমণের দায়ে হাজতবাস করছে।

তখন আমরা পাঠানকোটে থাকি। বীরেন একটা কোর্স করতে রাশিয়া গেছে। ছেলে মেয়ে দু'জনেই খুব ছোট। ক্লাস ওয়ান ও কে.জি.'তে পড়ে যথাক্রমে। তাদের স্কুল কামাই করে অতদিন আরায় গিয়ে মা-বাবার কাছে নিশ্চিন্ত আরামে থাকা যায় না। আবার ওদের নিয়ে স্কুল বন্ধ থাকার ক'হপ্তা আরায় কাটিয়ে আসবো তারও উপায় নেই। আড়াই দিনের ট্রেন সফর সহজ ব্যাপার নয়, দু'দুটো দুরন্ত বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে। ফলে সে বছরটা যাওয়া হ'ল না। পরের বছরও যেতে পারলাম না। গরমের ছুটির পুরোটাই এলাহাবাদে কাটলো আমার ছোট ননদের বিয়ের যোগাড় যন্তর ও আনন্দ উৎসবে। পুজোর ছুটিতেও যাওয়া হল না। দুটো বাচ্চাই

হামজ্বরে পড়লো পালাক্রমে।

দীর্ঘ দুবছর পর আরায় গিয়ে দেখলাম রামসেবক বাড়ির সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে। বাড়িতে অন্য কোন কাজের লোক নেই, রামসেবকই সামাল দিচ্ছে সব। বছর দুয়েক আগের সেই হাজতবাসের খবরটা তখনই কারও মুখে শুনতে পাই।

গুরুতর কোন অপরাধের দরুনই হাজতবাস করেছে রামসেবক। তবে প্রকৃত ঘটনা কেউ জানে না কারণ আমার বাবা-মা কারো কাছেই ভাঙ্গেননি ব্যাপারটা।

"রামসেবক তার নানির বাড়ি গিয়েছিল এবং সেখানে বিশেষ কোনও কাজে বছর দুয়েক আটকে পড়েছিল। দু'বছর পরে আবার ফিরে এসেছে।" এ-ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য এটুকুই।

।

তখনকার যুগটাই অন্যরকম ছিল। কিংবা হয়তো এটা আমাদের বাড়ির ধারা। সবরকম অপ্রিয় তথ্য আমার কাছ থেকে দূরে রাখা হত। বাবা যে অমন নিদারুণ অসুস্থ এবং অপারগ হয়েই কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলেছেন সে কথা আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে অনায়াসে বুঝতে পারতো। আমার মনে সন্দেহের ছায়ামাত্র পড়লো না। বাবা সারাজীবনে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেছেন। এখন আর তেমন প্রয়োজন নেই তাই ব্যবসাপাতি গুটিয়ে ফেলে বিশ্রাম করবেন। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় এসে সেটুকু তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। শুধু রামসেবকের উপস্থিতিটাই মেনে নিতে বাধতো। হিতৈষী প্রতিবেশীদের নিভৃতে দেওয়া খবর অনুযায়ী রামসেবক যদি সত্যিই জেলখাটা আসামী হয়, আমাদের সংসারে তার এই অবারিত চলাফেরা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। অথচ মায়ের বিন্দুমাত্র তাপ উত্তাপ নেই। বাবাও নির্বিকার।

বীরেন সরকারী চাকরি ছেড়ে কিছুদিন চাকরির বাজার সমীক্ষা করার পর আমাদের নিয়ে নাইজিরিয়ায় পাড়ি দিল। সেখানে প্রায় তিন বছর ছিলাম আমরা।

নাইজিরিয়ার পর বীরেনের পরবর্তী কর্মস্থল হল অস্ট্রেলিয়ায়। দীর্ঘ চার বছর সেখানেই কাটলো আমাদের। আমার দুই ছেলেমেয়ে বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করে। ছুটিতে আমাদের কাছে সিডনীতে চলে আসে।

সুদীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে আবার নিজের দেশে ফিরে এলাম। বীরেনের নতুন অফিস ব্যাঙ্গালোরে। সুন্দর ছিমছাম এলাকায় বাড়ি নিয়ে সংসার গুছিয়ে বসলাম। পুজোর সময় বাবা-মা'র কাছে যাবো, তাই আনন্দের সীমা নেই। প্লেনে একলাই চললাম। পাটনা থেকে ট্যাক্সিতে আরও ঘণ্টা তিনেকের পথ।

প্রবাসে থাকাকালে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বরাবর। তবু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে আমার আশৈশবের বাড়িঘর, অতি আদরের বাপের বাড়ি, নিশ্চিহ্ন হতে দেরী নেই আর। আবাহন - আগমনী সব কিছু সেরে এখন বিসর্জনের পালা। বীরেনের সঙ্গে ফোনে আলোচনা করে আরাতেই থেকে গেলাম। বাবার শেষ ক'টা দিন সেবা করে যতটুকু আত্মগ্লানি কমাতে পারি, অশক্ত অসুস্থ মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তার দুর্ভাগ্যের দিনে যদি এক বিন্দু সান্ত্বনা দিতে পারি। বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ত্রিকালের সাক্ষীর মত। যেন বজ্রদগ্ধ মহীরুহ সকল গৌরব হারিয়ে হতশ্রী নিঃস্বতার প্রতীক হয়ে বিস্মিত পথচারীদের অনুকম্পা কুড়োচ্ছে।

বাড়ির অধিকাংশ ঘর অব্যবহৃত পড়ে আছে কতকাল। দিনের বেলাতেও বিশেষ কোন সক্রিয়তার সাড়া পাওয়া যায় না বাড়িতে। দৈনিক প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া মা বাবার শয্যাপাশে থাকেন সর্বক্ষণ। বাড়িতে তৃতীয় যে ব্যক্তিটিকে দেখে আশ্চর্য হলাম সে রামসেবক। রামসেবক সব সময় এখানে থাকে না। তার নির্ধারিত সময়ে আসে কেবল। সকালে মা যখন স্নান সেরে তাঁর ও বাবার খাবার জোগাড় করেন - অতি সামান্য রান্না-বান্না - সেই সময় রামসেবক এসে বাবার কাছে বসে। বাবার খাটের পাশে মাটিতে বসে হিন্দি

খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। বাবা চোখ বুঁজে শুয়ে থাকেন। মাঝে মধ্যে হয়তো দু'একটা কথা বলেন। মাঝে মাঝে সুর করে নীচু গলায় রামচরিতমানস পড়ে শোনায় বাবাকে। মা সকালের কাজ-পাট সেরে বাবার ঘরে এলে রামসেবক চলে যায়। সন্ধ্যেবেলা আবার এসে বাবার পাশে বসে। সকালবেলা ও সন্ধ্যেবেলা বাড়ির কিছু কিছু কাজও করে রামসেবক। সারাদিন থাকে না। শুনলাম রামসেবক নাকি সাইকেল রিক্সা চালায়। সেটাই এখন তার পেশা। আমাদের বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। যা কিছু সব রামসেবকই করে রিক্সা চালানোর পর উদ্‌বৃত্ত সময়টাতে।

আমার মনের প্রশ্ন ও ব্যথা মা বুঝতে পেরেছিলেন। পিঠে হাত রেখে বললেন, তুই ভুল ভাবছিস রে! আমাদের টাকা পয়সার দরকার হলে তোকে তো বলতামই। তোর বাবার চিকিৎসায় কোন গাফিলতি হয়নি। এ রোগ যে সারবার নয়! তুই দূর বিদেশে মন খারাপ করবি বলে অত সব জানাইনি। তোর বাবাই মানা করলেন।

হয়তো তাই। সারাজীবন আমাকে সুখী দেখতে চেয়েছিলেন। তাই সব রকম দুঃখ কষ্ট সমস্যা থেকে আমায় আগলে রাখতেন দু'জনে। শেষ সময়েও এর অন্যথা হয়নি।

আমি বাড়ি যাবার পর আরও ন'দিন ছিলেন আমার বাবা। তারপর একদিন গভীর রাতে চলে গেলেন। রামসেবক আমাদের বাইরের বারান্দায় শুতো ইদানীং। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতো কোনও ধাবা-টাবা থেকে। বাইরে থেকেই আওয়াজ দিয়ে জানাতো যে ও এসে গেছে। যে রাত্রে বাবা গেলেন, রামসেবকই বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিউপূজন বাবুকে ও ডাক্তার বর্মাকে ডেকে এনেছিল। এই দু'জন বাবাকে নিয়মিত দেখতে আসতেন। শেষের দিকে যখন বাবাকে কড়া ওষুধ দিয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় রাখা হত রোগ-যন্ত্রনা প্রশমনের চেষ্টায়, তখনও শিউপূজন বাবু ও ডাক্তার বর্মা এসে বাবার শয্যার পাশে বসে থেকেছেন কতদিন।

বাবা নিজের নিশ্চিত মৃত্যুর কথা আগে থেকেই জানতেন। সব রকম ব্যবস্থা করে গেছেন তাই। তাঁর ইচ্ছামত শেষকৃত্য সমাধা হল। বাড়ি বন্ধ করে মাকে ব্যাঙ্গালোরে আনতে চাইলাম। মা বললেন আপাতত কানপুরে তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে থাকবেন কিছুদিন। বাবার জীবিত কালেই নাকি সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। আমার ছোটমামা সন্ন্যাসী টাইপের মানুষ। বিয়ে-থাওয়া করেননি। অনেক পড়াশোনা করলেও কোনও পাকা চাকরি বা পেশা ধরেননি কোনদিন। পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। কয়েকটা কল্যাণমূলক সংস্থায় কাজ করতেন।

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বীরেন এসেছিল, অনেক কষ্টে দিন আষ্টেকের ছুটি নিয়ে। বীরেন থাকায় কাজকর্মে অনেক সুবিধা হ'ল। রামসেবক সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাজ করতো, যখন যা দরকার। ওর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম নির্ভরশীলতা বীরেনকে মুগ্ধ করলো। এরপর যখন শুনলো রামসেবক আমাদের বাঁধা মাইনে করা কাজের লোক নয়, স্বেচ্ছায় এত বছর ধরে আমার বাবা-মাকে দেখাশোনা করে আসছে, ওর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বীরেনকে রামসেবকের জীবন রহস্য শোনালাম।

সব শুনে বীরেন বললো, "রামসেবক প্রকৃত সন্তানের কর্তব্য করেছে। এই অবস্থায় বাবা-মাকে ও-ই দেখাশোনা করে এসেছে এতদিন ধরে। তোমার মা অনাথ ছেলেটাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। রামসেবক মাতৃঋণ শোধ করছে।" অনেক বছর আগে কেউ রামসেবককে আমার মা'র পুত্রতুল্য বলে মন্তব্য করলে আমার মন নিদারুণ বিরূপতায় ভরে যেতো। আজ বিরূপতা নয় গভীর কৃতজ্ঞতায় সারা মন আপ্লুত হয়ে গেল।

মাকে কাণপুরে পৌঁছে দিয়ে আমরা ব্যাঙ্গালোরে ফিরে যাবো।
বীরেনকে বললাম, "রামসেবকের জন্যে কি আমরা কিছু করতে পারি না?"
বীরেন বললো, "ওকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার কথা ভাবছি।"

রামসেবক কোন কথাই শুনলো না। ও তখন গভীর শোকে আচ্ছন্ন। কিছু টাকা হাতে গুঁজে দিতে গেলাম, ও হাত সরিয়ে নিয়ে নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগলো। মা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠলেন।

তিন বছরের মধ্যে মা'ও চলে গেলেন। এর পর আর কোনদিন আরা যাওয়া হয়নি। মা যতদিন ছিলেন রামসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। রামসেবক মাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো। হিন্দীতে। মা'ও একে তাকে দিয়ে হিন্দীতে সেই চিঠির জবাব লিখে পাঠাতেন।

অনেক বছর পরে ব্যাঙ্গালোরে একটা পার্টিতে ডাক্তার বর্মার মেয়ে মনীশার সঙ্গে দেখা। তার স্বামী কার্যোপলক্ষে ব্যাঙ্গালোরে এসেছে। মনীশাও সঙ্গে এসেছে।

একথা সেকথার পর ও বললো, "রামসেবকের খবর শুনেছ নিশ্চয়ই। বেচারা!"

"কেন? কি হয়েছে?

মনীশার কাছে সেই মর্মন্তুদ ঘটনা সবিস্তারে শুনলাম। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আরার রমনা ময়দানে সকাল সন্ধ্যা স্বাস্থ্যসেবীদের আনাগোনা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ময়দান। কিনারায় ঝোপ ঝাড় আগাছার মাঝে আবর্জনার স্তূপ, আবর্জনা ফেলা মানা এই মর্মে নোটিস টাঙানো থাকা সত্ত্বেও। ইদানীং প্রাতঃভ্রমণকারীরা একটা তীব্র পচা গন্ধে উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। নাড়ি ওল্টানো পুতিগন্ধের তোড়ে খোলা হাওয়ায় হাঁটার মজাটাই মাটি। শেষে করিৎকর্মা কজন মিলে যথাস্থানে খবর দিলো। ঝোপের মধ্যে কোনও পশুর গলিত শব পড়ে ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে তার যথাযথ ব্যবস্থা করলো। ময়দান গন্ধমুক্ত হল।

রামসেবক অতশত খবর রাখে না। রোজকার মত রিক্সায় সওয়ারি নিয়ে স্টেশন থেকে ফিরছিল। করিম মিঁয়াকে তার লটবহরসমেত মিল্‌কি মহাল্লায় নামিয়ে দিয়ে নিজের আস্তানায় ফিরে যাবে। জেলরোডে জৈন মন্দিরের লম্বা টানা বারান্দার একপাশে রামসেবকের একক সংসার। বহুদিন ধরে এটাই তার একমাত্র বাসস্থান। মন্দিরের লোকেরা আপত্তি করেনি কোনদিন। ওকে হয়তো ওরা মন্দিরের অবৈতনিক রক্ষী বলে গণ্য করে!

আহিরি টোলার কাছাকাছি একটা ছোটমতন ভিড় জমা হয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশপানে হাত উঁচিয়ে স্লোগান ছাড়ছে সারা পাড়া সচকিত করে।

আহিরিটোলার মোড়ের সামনে রাস্তা বন্ধ। একগাদা হাবিজাবি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছে সামনের লোকগুলো। রামসেবকের মেজাজ গরম হয়ে গেল।

"একি ব্যাপার? রাস্তা বন্ধ কেন?"

কয়েকটা লোক এগিয়ে এসে রামসেবকের যাত্রিকে রিক্সা থেকে নামাতে গেল।

"আরে? এ কি করছো? সরে যাও।"

ওরা রামসেবকের কোন ক্ষতি করতে চায় না। শুধু ওর রিক্সার যাত্রিটিকে ওদের চাই। গরু মারার খেসারত হিসাবে। যাত্রিকে তাদের জিম্মায় দিয়ে রামসেবক রিক্সা নিয়ে বহাল তবিয়তে চলে যাক। যাত্রি বাছাধনকে এরা জ্যান্ত ছাড়বে না। রামসেবক বাধা দিয়েছিল। যাত্রিকে বাঁচাতে পারেনি। নিজেও মারাত্মক ভাবে জখম হল এবং দু'দিন পরে মারা গেল।

পুরো ব্যাপারটার তদন্ত হয়েছিল। প্রাতঃভ্রমণকারীদের মধ্যে যারা প্রথম দুর্গন্ধটা লক্ষ্য করেছিল এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দিয়েছিল, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী যারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছিল ও আশেপাশের আরও অনেক সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করে শেষ অবধি জানা গেল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন গুজব রটিয়ে কিছু লোক শহরে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছিল। তাদের সে চেষ্টা বিফল হয়েছে। ব্যাপারটা আর বেশীদূর

গড়ায়নি। শুধু দু'জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারালো।

বীরেন রামসেবককে একটা পাকা চাকরি জোগাড় করে দেবে বলেছিল। ওকে আমাদের ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম কখনো কোন প্রয়োজন পড়লে আমাদের জানাতে। ও কিন্তু এ সুযোগের সুবিধা নেয়নি কোনদিন। আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি রামসেবক বুঝতে পেরেছিল। আমাদের বদান্যতার দান নিয়ে আমার বাবা-মা'র সঙ্গে তার একান্ত ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে সে ছোট করতে চায়নি।